CT4 political process in India

2nd Semester (H)

Kamal Sarkar

ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি – অনাদি কুমার মহাপাত্র

Unit - VI - Affirmative Action policies - a caste and class

Ques (1) তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং অনগ্রসরতার সংজ্ঞা দাও?

(2) সংবিধানে বর্ণিত তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি (SC/ST)-দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গুলি আলোচনা কর? (বা: সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ কি)

(3) সংখ্যালঘুদের (minorities) এর জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

(4) সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত দাও?

(5) সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে mondal কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনা কর?

(6) উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগগুলি আলোচনা কর?

অধ্যায় ২৭

অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণীসমূহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

[Special Provisions for Backward Minorities]

অধ্যায়সূচী

// ① ভূমিকা ② সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয়তা ③ তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি ও অনগ্রসরতার সংজ্ঞা ④ সংখ্যালঘুদের স্বার্থে ব্যবস্থা ⑤ তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ⑥ সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত ⑦ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ⑧ মণ্ডল কমিশন এবং পরবর্তী অবস্থা ⑨ সংরক্ষণমূলক বিশেষ ব্যবস্থা — একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা ⑩ সংরক্ষণমূলক নীতির মূল্যায়ন //

২৭.১ ভূমিকা (Introduction)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান নির্বিশেষে মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার থেকে সাম্য প্রতিষ্ঠার সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে ভারতের শাসনব্যবস্থায় সাম্য ও ন্যায়-বিচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ আমলের সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতির স্থায়ী অবসানের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিভক্ত কর এবং শাসন কর' (Divide and Rule) নীতিকে কার্যকর করার জন্য ইংরেজরা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ব্রিটিশ আমলে আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এই সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করত সংখ্যালঘু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়। স্বাধীন ভারতে এই বিভেদমূলক নীতিকে বিসর্জন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান রচনার প্রাক্কালে গণপরিষদে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে ব্যাপক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সংখ্যালঘু প্রশ্নে মূলত তিনটি মত প্রতিপন্ন হয়। (১) এক দল সকল রকম আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। (২) আর একদল ব্রিটিশ আমলের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের আগেকার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। (৩) আর একদল ছিলেন মধ্যপন্থী। তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে কিছু আসন সংরক্ষণের কথা বলেন। কিন্তু এরা কোন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা বলেন নি।

এই বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে বিচার-বিবেচনার জন্য সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি (sub-committee) গঠন করা হয়। এই উপ-কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ আম্বেদকর, পণ্ডিত নেহরু ও কে. এম. মুন্সী। এই কমিটি আইনসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থে আসন সংরক্ষণের পক্ষে সুপারিশ করে। চূড়ান্ত বিচারে তফসিলী জাতি (Scheduled Castes), তফসিলী উপজাতি (Scheduled Tribes) এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় (Anglo-Indian Community)-এর জন্য সংরক্ষণমূলক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপরি-উল্লিখিত তিনটি জনগোষ্ঠীর জীবনধারাগত সমস্যা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এই কারণে এদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান সঙ্গত বিবেচিত হয়। তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতির মানুষরা হলেন সংখ্যালঘু। শুধু তাই নয়, তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এঁরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এবং শোষিত। সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার—এক কথায় জীবনধারাগত বিচারে এঁরা ভারতের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে একেবারে আলাদা। এই দুই পিছিয়ে-পড়া মানবগোষ্ঠীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এদের অনগ্রসরতা দূর করতে হবে এবং ভারতের অন্যান্য অগ্রসর জনগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত করতে হবে। গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ন্যায়-বিচারের স্বার্থে এটা দরকার। এই ব্যবস্থা সাম্যনীতির পরিপন্থী তো নয়ই, বরং বিশেষভাবে সাম্যনীতির অনুপন্থী।

ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হয়। এঁরাও সংখ্যালঘু। এঁদের জীবনধারাগত সমস্যা স্বতন্ত্র। ভাষা ও বংশগত বিচারে ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে এঁরা আলাদা। দীর্ঘদিন ধরে এঁরা কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন। স্বাধীন ভারতে এঁদের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করলে এই জনগোষ্ঠীকে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তা হবে নিত্যন্তই অন্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংবিধানে যে সমস্ত বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি স্বীকার করা হয়েছে, সেগুলি স্থায়ী নয়—অস্থায়ী। সাময়িককালের জন্য এই সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২৭.২ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয়তা (Need of Protective Provisions)

গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে সমাজের অনগ্রসর অংশের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশেষ সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার এই ব্যবস্থা পুরোপুরি সাম্যনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায়, তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিপন্ন হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণীগুলির স্বার্থে সংরক্ষণমূলক বিশেষ ব্যবস্থাদি নানা দিক থেকে যুক্তিযুক্ত। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে এই ব্যবস্থা নিত্যন্তই জরুরী। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের উপজাতিগুলির মধ্যে এক ধরনের ভারত-বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে দৃঢ়মূল কিছু ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভের কারণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মধ্যে নিহিত আছে। মণিপুর ও ত্রিপুরার উপজাতিগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা-চেতনা দানা বেঁধেছে। মিজোরাম ও নাগাভূমির উপজাতিসমূহ পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গোপন আন্দোলনের সামিল হয়েছে। এই সমস্ত উপজাতি ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তবুও তাদের মধ্যে সতত একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ বর্তমান। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতাই এর কারণ। তফসিলী জাতি, উপজাতি ও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির জন্য সামগ্রিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের স্বার্থে অর্থনৈতিক সংরক্ষণের এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় জাতীয় সংহতি-বিরোধী আন্দোলনকে আটকান যাবে না। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে এই ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

ভারতের অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করতে হবে। এই শ্রেণীগুলির দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে না পারলে ভারতীয় জনসমাজের মূল স্রোতধারায় তাদের আনা যাবে না। দীর্ঘকাল যাবৎ এই শ্রেণীর মানুষগুলি অবহেলিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের বঞ্চনার শেষ নেই। আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘদিন। তার ফলে সামগ্রিকভাবে তারা পিছিয়ে পড়েছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই জনগোষ্ঠীর মনে জাতীয় জীবনের প্রতি এক গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে। যেভাবেই হোক এই বিদ্বেষের অবসান ঘটাতে হবে। তা না হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই এদের অনগ্রসরতা ও অনুন্নত অবস্থা দূর করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই মানবগোষ্ঠীর সামগ্রিক ও দ্রুত উন্নতির স্বার্থে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জীবনধারার অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে এদের টেনে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সফল হতে পারলেই জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত হবে। ভারতের সমাজজীবনে স্বস্তির সৃষ্টি হবে। এই অবহেলিত মানবগোষ্ঠীর মূলত অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করতে পারলে তাদের মধ্যে প্রবাহমান বিক্ষুব্ধ মানসিকতাকে প্রশমিত করা যাবে। তফসিলী জাতি ও উপজাতিগুলির বিক্ষোভ বিদ্রোহ দূর করা সম্ভব হবে। সুতরাং এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে অস্বীকার করা যাবে না যে সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে আবশ্যক।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারত হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাই ভারতের সংবিধানে ধর্মীয় বিচারে পশ্চাদ্‌পদ বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এই সংরক্ষণমূলক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ধর্মকে বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয় নি। অনগ্রসর অংশ বলতে সংবিধানে আর্থ-সামাজিক, ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনগ্রসর অংশ বা শ্রেণীগুলিকে বোঝান হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সংবিধানে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

২৭.৩ তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং অনগ্রসরতার সংজ্ঞা (Definition of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwardness)

সাইমন কমিশন ১৯৩৫ সালে তফসিলী জাতি (Scheduled Castes) কথাটি ব্যবহার করে। ভারতের সংবিধানে এদের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ১৯৫০ সালে। ভারতের সংবিধানে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে তফসিলী জাতি (Scheduled Castes) বলতে কাদের বোঝাবে তা সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৬৬ (২৪) ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। তেমনি তফসিলী উপজাতি (Scheduled Tribes) বলতে কাদের বোঝায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সংবিধানের ৩৪২ ও ৩৬৬ (২৫) ধারায়। সংবিধানে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির কোন বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেন কারা তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির তালিকাভুক্ত হবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

তফসিলী জাতি ∬ সংবিধানের ৩৬৬ (২৪) ধারায় বলা হয়েছে: 'তফসিলী জাতি বলতে বোঝাবে সেই সমস্ত জাতি (Castes), বংশ (races) বা উপজাতি অথবা সেই সমস্ত জাতি, বংশ বা উপজাতির কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে যারা এই সংবিধানের প্রয়োজনার্থে ৩৪১ ধারা অনুসারে তফসিলী জাতি হিসাবে গণ্য হয়' ("Scheduled Castes means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution.")। সংবিধানের ৩৪১ (১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী কোন জাতি (castes), বংশ (races) বা উপজাতি (tribes) অথবা ঐ সমস্ত জাতি, বংশ বা উপজাতির কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে ঐ অঙ্গরাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তফসিলী জাতি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারেন। কিন্তু কোন অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের আগে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। সংবিধানের ৩৪১ (২) ধারায় এ ক্ষেত্রে সংসদকেও কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তফসিলী জাতির যে তালিকা প্রচার করেন সেই তালিকায় সংসদ আইনের মাধ্যমে নতুন জাতি, বংশ বা উপজাতি কিংবা ঐসব জাতি, বংশ বা উপজাতির কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। আবার ঐ তালিকা থেকে সংসদ কোন নাম বাদ দিয়ে দিতে পারে। তবে নতুন কোন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগের কোন বিজ্ঞপ্তির সংশোধন করা যাবে না।

তফসিলী উপজাতি ∬ সংবিধানের ৩৬৬(২৫) ধারায় বলা হয়েছে: 'তফসিলী উপজাতি বলতে বোঝাবে সেই সমস্ত উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় বা তাদের কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে যারা এই সংবিধানের প্রয়োজনার্থে ৩৪২ ধারা অনুসারে তফসিলী জাতি হিসাবে গণ্য হয়' ("Scheduled Tribes means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution.")। সংবিধানের ৩৪২(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কোন উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় কিংবা তাদের কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে ঐ রাজ্যের বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তফসিলী উপজাতি হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে এধরনের ঘোষণা করার আগে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। সংবিধানের ৩৪২(২) ধারায় এ ক্ষেত্রে সংসদকেও কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তফসিলী উপজাতির যে তালিকা প্রচার করেন সেই তালিকায় সংসদ আইনের মাধ্যমে নতুন উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় কিংবা তাদের কোন অংশ বা গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তেমনি ঐ তালিকা থেকে সংসদ কোন নাম বাদ দিয়ে দিতে পারে। তবে নতুন কোন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগের কোন বিজ্ঞপ্তির পরিবর্তন করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের নাম নির্ধারণ করে বিবিধ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। আবার এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তি পার্লামেন্ট পরিবর্তন ও সংশোধনও করেছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল : সংবিধান (তফসিলি জাতিসমূহ) নির্দেশ, ১৯৫০; সংবিধান (তফসিলী জাতি) (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ) নির্দেশ, ১৯৫০; সংবিধান (তফসিলি উপজাতিসমূহ) নির্দেশ, ১৯৫০ প্রভৃতি। রাষ্ট্রপতির নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তিকে সংশোধন করে পার্লামেন্ট সংশোধনী আইন প্রণয়ন করেছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল: "তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি নির্দেশসমূহ (সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ এবং পুনরায় ১৯৭৬ সালে।

ভারতের উত্তরপ্রদেশেই তফসিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক। তারপরেই পর্যায়ক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের স্থান। মধ্যপ্রদেশে তফসিলী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের সংখ্যা সব থেকে বেশী। তারপরেই ওড়িশা ও বিহারের নাম করতে হয়। ২০১১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান অনুসারে সমগ্র ভারতে তফসিলী জাতির মানুষের মোট সংখ্যা হল কুড়ি কোটি তের লক্ষ। ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৬.৬৬ ভাগ হল তফসিলী জাতি গোষ্ঠীর মানুষ।

জন্মগত বিচারেই কোন ব্যক্তি তফসিলী জাতি বা তফসিলী উপজাতির পরিচয় পায়। তফসিলী জাতি বা তফসিলী উপজাতির কোন পুরুষকে বিবাহ করে কোন মহিলা এই স্বীকৃতি পেতে পারে কিনা এ নিয়ে সংশয় ছিল। পাটনা হাইকোর্টের রায়ে এই সংশয়ের নিরসন হয়েছে। জয়পাল সিং ছিলেন বিহারের এক বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা। তিনি সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী জাহানারা জয়পাল সিং সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এ নিয়ে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মামলা হয়। এই মামলায় পাটনা হাইকোর্ট রায় দেন যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ মহিলা স্বামীর জাতিভুক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

অনগ্রসর শ্রেণী ।। সংবিধানে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (Backward Classes) জন্যও বিশেষ সংরক্ষণের উল্লেখ আছে। কিন্তু অনগ্রসরতার কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। তপসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতিগুলিও অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা ছাড়াও আরও কিছু শ্রেণীকে অনগ্রসর বলা হয়ে থাকে। অনগ্রসরতা নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে সে বিষয়ে সংবিধান নীরব। এ প্রসঙ্গে মহীশূর হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। এই হাইকোর্টের অভিমত অনুসারে অনগ্রসরতার অর্থ হল আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা [বি. এস. কেশব আয়েঙ্গার বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৫৬)]। আবার স্বাক্ষরতা হল শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা নির্ধারণের ভিত্তি [রামকৃষ্ণ রাম সিং বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৬০)]। দারিদ্র্য হল শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণ। সুতরাং একটি ন্যূনতম বার্ষিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা নির্ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত তথা বিজ্ঞানসম্মত। সুপ্রীম কোর্ট এম. আর. বালাজি বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৬৩) মামলায় এই অভিমত ব্যক্ত করেছে। সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হল অনগ্রসরতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাসঙ্গিক উপাদান হল জাতি। তবে এ ক্ষেত্রে জাতি একমাত্র উপাদান নয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক অনগ্রসরতা নির্ধারণের মানদণ্ড প্রসঙ্গে ব্যাপক মতানৈক্য আছে। সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মণ্ডল কমিশন রিপোর্টে অর্থনৈতিক অবস্থার বদলে জাতির উপরই জোর দেয়। মণ্ডল কমিশন ১৯৮০ সালের রিপোর্টে অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে সর্বমোট ৩৭৪৩টি সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ হল অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৭ সালের এক রিপোর্ট অনুসারে তামিলনাড়ু সরকার অনগ্রসরতার নির্ধারক হিসাবে জাতিকেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। মহীশূর সরকার কর্তৃক গঠিত মহীশূর অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের কমিশন' (Mysor Backward Classes Commission)-এর অভিমতও অনুরূপ। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কিন্তু কেবলমাত্র জাতিকে অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসাবে স্বীকার করে নি। কিন্তু অনগ্রসরতার শ্রেণীবিভাজন জাতির ভিত্তিতে করা না হলে তার বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না [চিত্রলেখা বনাম মহীশূর রাজ্য (১৯৬৪)]।

২৭.৪ সংখ্যালঘুদের স্বার্থে ব্যবস্থা (Provisions for Minorities)

তফসিলীভুক্ত জাতি, তফসিলীভুক্ত উপজাতি ছাড়াও ভারতে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। এই সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্য সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য অপরিসীম।

সংবিধানে দু' ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে: ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভাষাগত সংখ্যলঘু। যাই হোক সংবিধানের কোথাও কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় পর্যায়ে পাঁচটি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম বিজ্ঞাপিত করেছে। এগুলি হল: মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং জোরো আসস্ট্রিয়ান। ভাষাগত সংখ্যালঘু বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের মাতৃভাষা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বা রাজ্যের অংশবিশেষের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষার থেকে আলাদা। অর্থাৎ ভাষাগত সংখ্যালঘুর বিষয়টি রাজ্য-ভিত্তিক বিচারে পৃথকভাবে নির্ধারিত হয়।

সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়সমূহের সামাজিক, আর্থনীতিক এবং শিক্ষা-বিষয়ক স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থাসমূহের কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কতকগুলি ধর্মীয় ও ভাষাগত উভয় ধরনের সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের জন্য। আবার কতকগুলি ব্যবস্থা কেবলমাত্র ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য।

ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যবস্থা

(১) বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ ।। ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিশেষাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সাম্যের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থানভেদে বা তাদের কোন একটির ভিত্তিতে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না [১৫ (১) ধারা]। আবার কেবল উল্লিখিত কারণগুলির জন্য বা তাদের কোন একটির জন্য দোকান, সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রেস্তোরাঁ, হোটেল ও প্রমোদস্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গীকৃত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও সমাগমস্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বা অসামর্থ্য আরোপ করা যাবে না [১৫(২) ধারা]। তবে নারী, শিশু, সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে অনুন্নত শ্রেণী এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

(২) সরকারী চাকরিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ ।। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং অনুন্নত

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শ্রেণীর জন্য সরকারী চাকরিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। কোন নাগরিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মূল বংশ, জন্মস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে-কোন একটি কারণের জন্য সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবে না [১৬ (১) ও (২) ধারা]। অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকের জন্য সরকারী চাকরিতে আসন সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

(৩) ধর্মীয় স্বাধীনতা ∬ ভারতের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ। তার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের ও প্রচারের সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

(৪) ভাষা, লিপি বা কৃষ্টি সংরক্ষণ ∬ ভারতের নাগরিকদের কোন অংশের নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা কৃষ্টি থাকলে তা সংরক্ষণের মৌলিক অধিকার থাকবে [২৯ (১) ধারা]।

(৫) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানাধিকার ∬ কেবলমাত্র ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, ভাষা বা এর কোন একটির কারণে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন নাগরিককে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করা যাবে না [২৯(২) ধারা]।

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা ∬ সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের পছন্দমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে [৩০ (১)ধারা]।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি সাহায্যে সাম্য ∬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারি সাহায্যের ব্যাপারে ভাষাগত বা ধর্মগত কারণে কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না [৩০ (২) ধারা]।

(৮) ক্ষতিপূরণ প্রদানে সাম্য ∬ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অর্জন করার জন্য বিধি দ্বারা স্থিরীকৃত বা তদনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ যেন সংশ্লিষ্ট প্রকরণ অনুযায়ী প্রত্যাভূত অধিকার সঙ্কুচিত বা রদ না করে। সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই বিষয়টি সংবিধানের ৩০ (১ক) ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

(ক) মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ∬ ভাষাগত সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত নির্দেশ প্রদান করতে পারেন [৩৫০ (ক) ধারা]। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৬ সালের ৭ম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা সংযুক্ত হয়েছে।

(খ) ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কর্মচারী ∬ ভারতের সংবিধানে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন পদস্থ বিশেষ কর্মচারী (Special Officer) নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই কর্মচারী রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করবেন। রাষ্ট্রপতি এই প্রতিবেদনটি পার্লামেন্টের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের কাছে পাঠাবেন [৩৮০ (ক) ধারা]। এই ব্যবস্থাটিও ৭ম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে।

(গ) কোন রাজ্যের জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যদি দাবি করে যে তারা যে ভাষা ব্যবহার করে তা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হন, তা হলে রাষ্ট্রপতি তা কার্যকর করার জন্য সদর্থক নির্দেশ দিতে পারেন।

(ঘ) কেন্দ্র বা রাজ্যে ব্যবহৃত যে কোন ভাষায় যে কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি তাঁর অভিযোগ বা আবেদন কেন্দ্র বা রাজ্যের কোন আধিকারিক বা কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন। সরকারি ভাষায় না হওয়ার জন্য কোন আবেদনপত্রকে বাতিল করা যাবে না।

সংখ্যলঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন ∬ ১৯৯২ সালে পার্লামেন্ট সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন আইন প্রণয়ন করে। তদনুসারে ১৯৯৩ সালে সংখ্যালঘুদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন বৈধ মর্যাদা সম্পন্ন। ১৯৭৮ সালে যে সংখ্যালঘু কমিশনটি গঠিত হয়েছিল, তার কোন বৈধ মর্যাদা ছিল না। তার জায়গায় এই নতুন কমিশনটি গঠিত হয়। এই নতুন কমিশন একজন সভাপতি, একজন সহ সভাপতি এবং পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত; কেন্দ্রীয় সরকার এঁদের মনোনীত করে। এঁদের কার্যকাল তিন বছর।

এই কমিশন সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রগতি প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করে। সংখ্যালঘুদের জন্য সংবিধানে স্বীকৃত সংরক্ষণমূলক বিশেষ ব্যবস্থাদির তদারকি করে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনসমূহে সংখ্যালঘুদের জন্য যে সমস্ত বিশেষ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থাদি বর্তমান সে সবের কার্যকারিতা ও ফলাফল কমিশন পর্যালোচনা করে। সংখ্যলঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের সহায়ক বিশেষ ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিশন বিবিধ সুপারিশ করে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি ছাড়াও তফসিলী উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভারতের সংবিধানে বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ও নির্দেশ আছে।

২৭.৫ তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Special Provisions for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

তফসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা দরকার // গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের উন্নতির উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সংস্থান সংবিধানে আছে। বিপুল সংখ্যক তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সংস্থান ভারতের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণীর অধিবাসিগণ দেশের অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে সমাজের এই অনুন্নত অংশকে উন্নত অংশের পর্যায়ে উন্নীত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে এদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য এবং সাম্য নীতির বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদির সাহায্যে এই শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নতিসাধন অত্যন্ত জরুরী।

তফসিলী জাতি ও উপজাতির ধারণা // ভারতীয় সংবিধানে তপসিলীভুক্ত জাতি বা উপজাতির কোন সংজ্ঞা নেই। কারা এই দুই শ্রেণীভুক্ত হবেন তা রাষ্ট্রপতি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করেন। কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে পরমার্শ করেন। সংবিধানের ৩৪১ ও ৩৪২ ধারায় এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। তা ছাড়া সংবিধানের ৩৬৬ (২৪) ধারায় 'তফসিলী জাতি' ও ৩৬৬ (২৫) ধারায় 'তফসিলী উপজাতি' বলতে কি বোঝাবে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরকারী বিজ্ঞপ্তি হিসাবে প্রচারিত তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির তালিকায় পার্লামেন্ট নতুন জাতি বা উপজাতির নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারে; আবার কোন নাম বাদও দিতে পারে। তবে পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিকে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে বদলান যায় না। যাইহোক, রাষ্ট্রপতি ও সংসদের হাতে তফসিলী জাতি ও উপজাতি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এইভাবে প্রয়োজনমাফিক নমনীয় ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তি জন্মসূত্রেই জাতি বা উপজাতি হন। পাটনা হাইকোর্টের একটি রায় অনুসারে কোন মহিলা বিবাহসূত্রে স্বামীর জাতি লাভ করেন।

ভারতে সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ভিত্তি হল অনগ্রসরতা (Backwardness)। আবার অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থে সংরক্ষণ বলতে মূলত তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের কথাই বোঝায়। সংবিধানের ষোড়শ অংশে (Part XVI) 'কতিপয় শ্রেণীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা' (Special Provisions Relating to Certain Classes)-র কথা বলা হয়েছে। কতিপয় শ্রেণী বলতে তফসিলী জাতি (Scheduled Castes), তফসিলী উপজাতি (Scheduled Tribes) এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় (Anglo-Indian Community)-র কথাই বলা হয়েছে। সংবিধানের ষোড়শ অধ্যায়ে ৩৩০—৩৪২ এই তেরটি ধারার মধ্যে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদির উল্লেখ আছে।

(১) আইনসভায় আসন সংরক্ষণ // তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য লোকসভায় এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে (৩৩০ এবং ৩৩২) ধারা। সংবিধানের ৭৩-তম সংশোধনী আইন অনুসারে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা ক্রমস্তরবিন্যস্ত। এখানে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে সমাজের অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা বিশেষভাবে দরকার। এদের জনসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় সংরক্ষিত আসনসংখ্যা নির্ধারিত হবে। তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির লোকসংখ্যা যে অঙ্গরাজ্যে অধিক সেখানে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাও বেশি। অসম বিধানসভায় স্ব-শাসিত জেলার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। অসমের স্ব-শাসিত জেলা থেকে কেবল তফসিলী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীই নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পান। বর্তমান লোকসভায় তফসিলী জাতির জন্য ৮৪টি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্য ৪৭টি আসন সংরক্ষিত আছে। রাজ্য বিধানসভাগুলিতে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা যথাক্রমে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

৬০৭ এবং ৫৫৪। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। এই আসন সংরক্ষণের মেয়াদ সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার দিন থেকে দশ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলা হয়েছিল। কিন্তু সংবিধানের ৮ম (১৯৫৯), ২৩তম (১৯৭০), ৪৫তম (১৯৮০), ৬২তম (১৯৯০) এবং ৭৯তম (১৯৯৯) সংবিধান সংশোধনের দ্বারা আসন সংরক্ষণের এই মেয়াদ ধাপে ধাপে ২০১০ সালের ২৫ শে জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। ২০১০ সালে ৯৫তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণের মেয়াদ পুনরায় ১০ বছর বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ এই সংরক্ষণের মেয়াদ ২০২০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ৫৮তম সংবিধান সংশোধনী (১৯৮৭) আইনের মাধ্যমে নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশের বিধানসভায় তফসিলী জাতি ও উপজাতির মানুষদের অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(২) **সরকারী চাকরি সংরক্ষণ** // তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী চাকরি বা পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে শাসনকার্য পরিচালনায় দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারী চাকরিতে এরকম সংরক্ষণমূলক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে (৩৩৫ ধারা)। অর্থাৎ এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা শর্তহীন নয়, শর্তসাপেক্ষ। সংবিধানে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য চাকরি সংরক্ষণের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য কি পরিমাণ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে এবং সংরক্ষণের মেয়াদও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যতদিন এই পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীগুলি আর্থিক ও শিক্ষাগত বিচারে অন্যান্য ভারতীয়দের সমপর্যায়ভুক্ত না হচ্ছে ততদিন এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে। অর্থাৎ অনগ্রসরতার ভিত্তিতেই এই সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। বর্তমানে সরকারী নীতি অনুসারে প্রতিযোগিতা মারফত সর্বভারতীয় চাকরির ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ তফসিলী জাতিদের জন্য এবং শতকরা ৭ ½ ভাগ তফসিলী উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু যে সমস্ত সর্বভারতীয় চাকরিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তফসিলী জাতির জন্য ১৬ ⅔ ভাগ এবং তফসিলী উপজাতিদের জন্য ৭ ½ ভাগ চাকরি বা পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তফসিলী জাতি ও উপজাতিগুলিকে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালের ৭ই আগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং সংসদে ঘোষণা করেন যে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য এখন থেকে শতকরা ২৭ ভাগ পদ সংরক্ষিত থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকৃত সকল দপ্তর ও সংস্থার ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ প্রযোজ্য হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী সিং-এর ঘোষণা অনুসারে মণ্ডল কমিশনের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চাকরির বয়স এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রেও এদের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা আছে। সরকারী চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা পাঁচ বছর শিথিল করা হয়ে থাকে। তফসিলী জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য চাকরি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়, রাজ্যগুলিও সেই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে অথবা আইন প্রণয়ন করতে পারে। কোন সরকারকে এ বিষয়ে বাধ্য করা যায় না। অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য এই পদ সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রামস্বামী সি. এ. রাজেন্দ্রন (১৯৬৭) মামলায় মন্তব্য করেছেন যে সংবিধানের ১৬(৪) ধারা মোতাবেক চাকরিতে পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতা হল স্ব-বিবেচনামূলক।

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের রায় // প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ১৯৯১ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এক ঘোষণায় তফসিলী জাতির জন্য ১৫ শতাংশ, তফসিলী উপজাতির জন্য ৭.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ২৭ শতাংশ সরকারী চাকরি সংরক্ষণের কথা বলেন। তা ছাড়া এই ঘোষণায় সকল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দরিদ্রদের জন্য ১০ শতাংশ সরকারী চাকরি সংরক্ষণের কথা বলা হয়। তার ফলে সরকারী চাকরিতে সংরক্ষণের পরিমাণ ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। সুপ্রীম কোর্ট ১৯৯২ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে প্রদত্ত এক রায়ে ঘোষণা করে যে অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য সরকারী চাকরিতে আসন সংরক্ষণ বৈধ। তবে ৭ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ চাকরিতে সংরক্ষণের মাত্রা ৫০ শতাংশের মধ্যে বেঁধে দেয়। তারপর সুপ্রীম কোর্টের ৯ জন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে সংরক্ষণের বিষয়টি আসে। ১৯৯২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত রায়ে ৫ জন বিচারপতি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্তকে বৈধ বলে রায় দেন। তবে ৪ জন বিচারপতি ভিন্ন মত পোষণ করেন। আবার ৮ জন বিচারপতি ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঘোষণা করেন যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা চাকরিতে কেবল প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে, চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা কার্যকর হবে না।

মণ্ডল কমিশনের ব্যাপারে সংখ্যালঘু কমিশনের সুপারিশ // সংখ্যালঘু কমিশন সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে ২৭% পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সমর্থন করেছে। সংখ্যালঘু কমিশন ১৯৯২ সালে তার এক প্রতিবেদন পেশ করে। সংখ্যালঘুদের জন্যও মণ্ডল কমিশনের সুপারিশসমূহ প্রয়োগ করার ব্যাপারে সংখ্যালঘু কমিশনের প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের যুক্তি দেখিয়ে এই কমিশন সংখ্যালঘুদের জন্যও সরকারী চাকরিতে আসন সংরক্ষণের পক্ষে মত প্রকাশ করে। আরও বলা হয় যে সমস্ত শ্রেণী, বর্ণ ও বৃত্তিকে অনগ্রসরতার মানদণ্ড হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, তা কেবল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অনুচিত। সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা সম্প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয়। তবে চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকের অভিমত অনুসারে সরকারী চাকরিতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির পরিপন্থী প্রতিপন্ন হবে।

ডঃ আম্বেদকর গণপরিষদে এ বিষয়ে আলোচনার প্রাক্কালে মন্তব্য করেছিলেন যে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা উচিত। মহীশূর হাইকোর্ট **রামকৃষ্ণণ রাম বনাম মহীশূর রাজ্য** (১৯৬০) মামলায় অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ২২ শতাংশের অধিক আসন সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। **বালাজী বনাম মহীশূর রাজ্য** (১৯৬৩) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ৫০ শতাংশের অধিক আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছে। সুপ্রীম কোর্টের অভিমত হল এই সংরক্ষণের হার মাত্রাতিরিক্ত ও অযৌক্তিক হবে না। তা ছাড়া সংরক্ষণের নীতি 'সাধারণ প্রতিযোগিতা' (general competition) ও 'দক্ষতা' (efficiency)-কে ক্ষুণ্ণ করবে না।

২৮.৬.৯৪ তারিখে বিধানসভায় রাজ্য আদিবাসী ও তফসিলী (চাকরি ও পদ সংরক্ষণ) সংশোধনী বিল এবং তফসিলী ও আদিবাসী (চিহ্নিতকরণ) সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। এই বিলের ব্যবস্থা অনুসারে তফসিলীদের চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কোটা ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ২২ শতাংশ। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হল ৬ শতাংশ।

২০০০ সালের ৮২তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অধীন জনপালন কৃত্যকসমূহে তফসিলী জাতিসমূহের ও তফসিলি উপজাতিসমূহের স্বার্থে যে কোন পরীক্ষায় যোগ্যতা নির্ধারক নম্বর হ্রাস করার জন্য, বা মূল্যায়নের মান হ্রাস করার জন্য যে কোন সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে বলে বলা হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হবে।

(৩) শিক্ষায়তনে আসন সংরক্ষণ ∫∫ রাষ্ট্র তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে [১৫ (৪) ধারা]। শিক্ষায়তনে ভর্তির ক্ষেত্রে এই রকম বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে পারে [২৯ (খ) ধারা]। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য কোন কোন রাজ্যে শিক্ষায়তনে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে কেবল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেই এই সংরক্ষণ নীতি প্রযোজ্য। ৯৩তম সংবিধান সংশোধনী (২০০৫) আইনে ১৫(৫) ধারা যুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের নাগরিক বা তপসিলি জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমেত যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। তবে সংবিধানের ৩০(১) ধারায় উল্লিখিত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। সংবিধানের ১৫ ধারা বা ১৯(১)(ছ) ধারা এক্ষেত্রে কোনরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সরকার স্বীকৃত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তফসিলী জাতিভুক্তদের জন্য ২২ শতাংশ এবং তফসিলী উপজাতি ভুক্তদের জন্য ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিটেক্‌নিক, নার্সিং, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক কলেজেও এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

(৪) শিক্ষা ও আর্থনীতিক স্বার্থের উন্নতি সাধন ∫∫ সংবিধানের ৪৬ ধারা অনুসারে রাজ্য, বিশেষ যত্নসহকারে, জনসাধারণের দুর্বলতর অংশের, এবং বিশেষত তফসিলি জাতি ও তফসিলী উপজাতিসমূহের শিক্ষা-বিষয়ক ও আর্থনীতিক স্বার্থের উন্নতি সাধন করবে এবং তাদের সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করবে।

(৫) বিশেষ অফিসার নিয়োগ ∫∫ তফসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য একজন বিশেষ অফিসার (Special Officer) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে (৩৩৮ ধারা)। রাষ্ট্রপতি এই অফিসারকে নিযুক্ত করেন। প্রথম ১৯৫৫ সালে এই বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হয়। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য সংবিধানে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এই অফিসার অনুসন্ধান করেন এবং এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি এই রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করেন। বর্তমানে এই অফিসারকে তফসিলী জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত কমিশনার (Commissioner for Scheduled Castes and Tribes) বলা হয়। তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি বিষয়ক কমিশনারের দপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে এই পুনর্গঠন কার্য সম্পাদন করা হয়। সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীন একজন ডিরেক্টর জেনারেল (Director General)-এর তত্ত্বাবধানে একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিরেক্টর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য আছেন আঞ্চলিক ডিরেক্টর পাঁচ জন এবং ডেপুটি ডিরেক্টর ন'জন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৯৯০ সালের ৬৫তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে একটি নতুন ও অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি হল তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন। একজন সভাপতি, একজন সহ সভাপতি এবং পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি এদের নিযুক্ত করেন। কমিশনের সভাপতি সমেত সকল সদস্যের কার্যকাল এবং কাজের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন।

২০০৩ সালের ৮৯তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে এই কমিশনকে দ্বিধা বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে তফশিলি জাতিসমূহের জন্য একটি জাতীয় কমিশন এবং তফশিলি উপজাতিসমূহের জন্য আর একটি জাতীয় কমিশন বর্তমান। এই দুটি কমিশনের প্রতিটি গঠিত হয় একজন সভাপতি, একজন সহসভাপতি এবং তিনজন সদস্যকে নিয়ে। রাষ্ট্রপতি এদের নিযুক্ত করেন। উভয় কমিশনেরই কার্যাবলী অভিন্ন। (ক) তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিসমূহের জন্য স্বীকৃত সংরক্ষণমূলক যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা। (খ) তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিসমূহের সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা ও অধিকারসমূহের বঞ্চনা বিষয়ক নির্দিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। (গ) সংশ্লিষ্ট সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির সক্রিয়তা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কাছে বাৎসরিক বা সাংবিধানিক প্রয়োজন মত প্রতিবেদন পেশ করে।

সংশ্লিষ্ট আইনের ৮ ধারা মোতাবেক কোন বিষয় বা অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় কমিশন দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি তার এক্তিয়ার বৃদ্ধি করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অন্য যে কোন অনগ্রসর জাতি বা একাধিক জাতি বা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় এই কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে [৩৩৮(১০) নং অনুচ্ছেদ]।

(৬) কমিশন নিয়োগ ∬ তফসিলী অঞ্চলের প্রশাসন এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতি যে-কোন সময় একটি তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে পারেন। তবে সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছর পর এই রকম কমিশন নিয়োগ করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য (৩৩৯ ধারা)। তা ছাড়া এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ে অবস্থা ও অসুবিধাগুলির অনুসন্ধান এবং অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য রাষ্ট্রপতি আর একটি কমিশন নিয়োগ করতে পারেন (৩৪০ ধারা)।

(৭) কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ∬ তফসিলী শ্রেণীগুলির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোন রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে পারে (২৭৫ ধারা)। রাজ্য সরকারগুলি তফসিলী উপজাতিসমূহের উন্নয়নের স্বার্থে যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং তফসিলী সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে তা দেখার জন্য পার্লামেন্টের একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) আছে।

(৮) সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলে বিশেষ ব্যবস্থা ∬ সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের শাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিকে 'তফসিলি অঞ্চল' এবং উপজাতি অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

(৯) উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ∬ আবার সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা রাজ্যে তফসিলী উপজাতিদের কল্যাণের জন্য একজন করে মন্ত্রী থাকবেন [১৬৪ (১) ধারা]। তফসিলী জাতি ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের ব্যাপারেও এই মন্ত্রী তদারকি করেন। বর্তমানে প্রায় সকল রাজ্যেই তফসিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণের জন্য পৃথক দপ্তর আছে।

(১০) অন্যান্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা ∬ ভারতীয় সংবিধানে তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সংবিধানের ৩৩০—৩৪২ ধারার কথা বাদ দিলেও ১৫(৪), ১৬ (৪), ১৭ এবং ১৯(৫) ধারায় তফসিলী শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতির মাধ্যমেও এই শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কেবল সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে অনুন্নত শ্রেণীসমূহের সামগ্রিক উন্নয়ন কতদূর সম্ভব এ বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংবিধান স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা লাভের দীর্ঘকাল পরেও এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাম্য বিকাশ ঘটে নি। তাই অনেকের মতে সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থাদির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১১) বিশেষ আদালত ∬ তফসিলী সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ আদালত গঠনের ব্যাপারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে ১৯৮৯ সালে একটি বিল পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপের আমলে ১৯৯০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে জেলায় জেলায় এই বিশেষ আদালত গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২৭.৬ সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত (Arguments for and against Reservation)

সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির পক্ষে মত // জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তফসিলী জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি সমর্থন করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ভারতীয় সমাজে এদের একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবোধ আছে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে তফসিলী জাতি ও উপজাতীয়দের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। মণিপুর ও ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা আছে। মিজো ও নাগা উপজাতিদের মধ্যেও এই প্রবণতা বর্তমান। সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতেই উপজাতিগুলির মধ্যে জাতীয় সংহতি-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিবঙ্গের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন এমনই একটি আন্দোলন। এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন তফসিলী জাতির মধ্যেও ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছে। এই কারণে সামাজিক সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে এই সমস্ত মানুষের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিপক্ষে মত : আবার এক্ষেত্রে ভিন্ন মতের অবকাশ আছে।

(১) জন্মগত অধিকার ভাবছে // তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষ সাংবিধানিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসছে। এখন তফসিলী সম্প্রদায় এগুলিকে তাদের জন্মগত অধিকার হিসাবে ধরে নিয়েছে। তফসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস আজ দৃঢ়মূল হয়ে গেছে যে তারা এই সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আবহমানকাল ধরে ভোগ করে যাবে। ভারতের একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মানসিকতা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সতর্ক থাকা দরকার।

(২) নির্বাচনে এই শ্রেণীর সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় ক্ষমতাসীন কোন দলই এই বিশেষ সুবিধাগুলি বিলোপ করবে বলে মনে হয় না। অথচ কোন যুক্তিতেই এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কাল চালু রাখা যায় না।

(৩) আবার এই সমস্ত বিশেষ-সুবিধার কল্যাণে বেশ কিছু তফসিলী পরিবার বা ব্যক্তি সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাদের জন্যও এই সমস্ত বৈষম্যমূলক সংরক্ষণের ঢালাও ব্যবস্থার স্বীকৃতির কোন সঙ্গত কারণ নেই। অনগ্রসর শ্রেণী নির্ধারিত হয় জাতির ভিত্তিতে । অথচ কোন একটি জাতির নির্দিষ্ট একটি অংশ অনগ্রসর নাও থাকতে পারে।

(৪) প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন আছে এমন অনেক দুঃস্থ ব্যক্তি অপরিহার্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

(৫) প্রত্যাশিত উন্নতি হয় নি // চার দশকের বেশি সময় ধরে এই সমস্ত তফসিলী সম্প্রদায় সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। অথচ এদের মধ্যে অভিপ্রেত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিশেষত তফসিলী উপজাতিদের মধ্যে সংবিধান-স্বীকৃত এই সমস্ত ব্যবস্থাদির ফলাফল আরও হতাশাজনক। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের ১৯৮৩ সালের একটি প্রতিবেদন প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে যে তফসিলী জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য সংরক্ষিত ৩৫২ টি পদ ১৯৮১-'৮২ সালে পূরণ করা যায় নি।

(৬) সরকারী চাকরি বা পদে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা, বিশেষজ্ঞতা, নৈপুণ্য প্রভৃতি একান্তভাবে অপরিহার্য। এ বিষয়ে একমাত্র মেধাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা দেশ ও দেশবাসীর সামগ্রিক ক্ষতি করবে।

(৭) রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের হাতিয়ার // সমাজের অনগ্রসর অংশের ধারণাকে এখন রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে সংবিধান রচয়িতাদের সহানুভূতি সাধুবাদযোগ্য কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বিষয়টিকে রাজনৈতিক মুনাফা লাভের প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছেন। নির্বাচনে সুবিধা লাভ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা রক্ষা করার অন্যতম কৌশল হিসাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা হল রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের অন্যতম হাতিয়ার।

(৮) অনেক সময় সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য বাস্তবে উচ্চজাতির মেধাবী ব্যক্তিরা বঞ্চিত হন। তার পরিবর্তে নিম্নজাতির নিম্নমানের ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন। এতে শুধু চাকরির মান হ্রাস পায় তা নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে বিরোধ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সমাজে জাতিগত বিচারে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হলে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৯) এলিট শ্রেণী সৃষ্টি // সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগের মাধ্যমে তফসিলী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে একটি অভিজাত গোষ্ঠী (elite group) -র সৃষ্টি হয়েছে। সংরক্ষণের একচেটিয়া অধিকার ও যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এই গোষ্ঠীর হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। সংরক্ষণের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগ করছে তফসিলী সম্প্রদায়ের উন্নত অংশ। পরিসংখ্যান থেকে পরিলক্ষিত হয় যে মূলত এই সম্প্রদায়ের ডাক্তার, উকিল এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিরাই সংরক্ষিত কোটার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের দীনদরিদ্র অংশ সংরক্ষণের সুযোগ নিতে পারছে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(১০) সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ∫∫ এই সমস্ত কারণে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে এমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে যা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি জনসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় আসন, চাকরিতে পদ ও অন্যান্য সংরক্ষণমূলক ও আইনগত সুবিধাদি দাবি করছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কোন কোন দল এই সব দাবিকে সমর্থনও করছেন। ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা একটি সমস্যা হিসাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। সংরক্ষণের প্রশ্নেও বিভেদমূলক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে। অনৈক্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন দেশের আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করছে। এই সমস্ত আন্দোলনকারীদের অভিমত হল জাতির পরিবর্তে দারিদ্র্যকেই অনগ্রসরতার ভিত্তি বিবেচনা করতে হবে। এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে মেধাই হবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

মণ্ডল কমিশনের অভিমত ∫∫ ভারত সরকার বি. পি. মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রশ্নে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন মণ্ডল কমিশন হিসাবে পরিচিত। ১৯৮০ সালে এই কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিশনের অভিমত হল ভারতের সমাজব্যবস্থা ক্রমস্তরবিন্যস্ত। ভারতীয় সমাজ বর্ণ ও জাতির ভিত্তিতে স্থায়িভাবেই স্তরবিন্যস্ত। এ ধরনের এক সামাজিক কাঠামোতে তথাকথিত নিম্ন বর্ণ ও জাতির মানুষ দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত, অত্যাচারিত ও শোষিত হয়ে আসছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই মানবগোষ্ঠী বৈষম্যমূলক আচরণ ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়েছে। তার ফলে এই মানবগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়েছে। সুতরাং সামাজিক অনগ্রসরতা এবং নিম্নজাতির বিষয়টি একীভূত হয়ে গেছে। এই কারণে মণ্ডল কমিশন অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করে নি। মণ্ডল কমিশন তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের মাত্রা ৫০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করে। আদিবাসী ও হরিজনদের ২২.৫ শতাংশ এবং অপরাপর অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।

অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যাপারে ভারতে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের শাসনাধীন রাজ্য সরকারগুলি বিশেষভাবে উদ্যোগী। কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার ৮০ শতাংশ, তামিলনাড়ুর এ.আই.এ.ডি. এম. কে. সরকার ৬৯ শতাংশ সংরক্ষণের আইন পাশ করেছে। উত্তর প্রদেশে সংরক্ষণের সীমা ৬০ শতাংশ। এ ব্যাপারে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বি. জে. পি. কোন দলই বিরোধিতা করেন নি।

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত' (ও বি সি)-দের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিচারপতি এ. এন. সেনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৪টি শ্রেণীকে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করেছে। এগুলি হল : (১) কাপালি, (২) বৈশ্য কাপালি, (৩) কূর্মি, (৪) সূত্রধর, (৫) কর্মকার, (৬) কুম্ভকার, (৭) স্বর্ণকার, (৮) তেলি, (৯) নাপিত, (১০) যোগী—নাথ, (১১) গোয়ালা—গোপ, (১২) ময়রা—মোদক (হালওয়াই), (১৩) বারুজীবী এবং (১৪) সচ্চাষী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশ নামা [নং ৩৭৫(৬০)টি ডব্লিউ / ই সি/ এম আর— ১০৩/৯৪]-য় বিস্তারিত একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে কারা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হলেও চাকরি সংরক্ষণের সুযোগ পাবে না। অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত অন্যান্যরা সরকারী চাকরিতে পাঁচ শতাংশ সংরক্ষণের সুযোগ পাবে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী চাকরিতে নিম্নোক্ত ছ'শ্রেণীর মানুষ সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না।

(ক) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি সাংবিধানিক পদাধিকারীদের পুত্রকন্যা।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের পুত্রকন্যা। পরবর্তী চারটি শ্রেণীতে আছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী অফিসার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পদস্থ অফিসার এবং সামরিক বাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসারদের পুত্রকন্যা।

আবার বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয়যুক্ত ব্যক্তি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হলেও তাঁদের পুত্রকন্যারা সরকারী চাকরিতে সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না। তা ছাড়া সরকার ঘোষিত উর্ধ্বসীমার ৮৫ শতাংশ বা তার অধিক পরিমাণ সেচসেবিত কৃষিজমি থাকলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরাও চাকরিতে সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন না। এ ছাড়া পিতার সম্পদের পরিমাণ পর পর তিন বছর সম্পদকর ছাড়ের আওতা ছাড়িয়ে গেলে ছেলেমেয়েরা সরকারী চাকরিতে সংরক্ষণের সুযোগ হারাবেন।

তা ছাড়া শর্তসাপেক্ষে সংরক্ষণের সুযোগের বাইরে থাকবেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, লেখক, সাংবাদিক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট প্রভৃতি বৃত্তির ব্যক্তিবর্গ এবং শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গের পুত্রকন্যারা।

উপসংহার ∫∫ প্রকৃত প্রস্তাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনগ্রসরতার সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। সংরক্ষণ হল একটি সংস্কারমূলক ও সাময়িক ব্যবস্থা । সমাজের অনগ্রসর অংশের দাবি-দাওয়াকে একটি সামাজিক ও

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা দরকার। অনগ্রসর শ্রেণীগুলির মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবই হল এর মূল কারণ। ভারতের বর্ণ-বিন্যস্ত সমাজে নিচু জাতির মানুষের প্রতি বৈষম্য-বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা-অবহেলার মনোভাব এখনও বর্তমান। তাই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা হরিজন নিগ্রহের ঘটনা এখনও ঘটে। একথা আজ প্রমাণিত যে কেবল সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণীগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরেও কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক। বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে অনৈক্য ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তা দূর করা দরকার। তার জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক পথে উৎপাদন-উপাদানের সামাজিক মালিকানার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে।

২৭.৭ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (Special Provisions for the Anglo-Indian Community)

ইঙ্গ-ভারতীয়দের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা আছে ∬ ভারতে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় (Anglo-Indian Community) হল সংখ্যালঘু। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে এই সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। তখন থেকেই এই জনগোষ্ঠী বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করে আসছিলেন। স্বাধীন ভারতেও এই সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সংবিধান রচয়িতারা যত্নবান হন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ-রক্ষার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভারতের সংবিধানে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়।

ইঙ্গ-ভারতীয় কাকে বলে? ∬ ইঙ্গ-ভারতীয় বলতে কাদের বোঝায় সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। পিতা বা পিতৃপুরুষদের কোন একজন ইউরোপীয় ভারতীয় ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাসকারী হলে এবং ভারতে পিতা-মাতা স্থায়িভাবে বসবাসকালীন সময়ে সন্তানের জন্ম হলে, সেই সন্তান ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

আইনসভায় আসন সংরক্ষণ ∬ সংবিধানের ষোড়শ ভাগে (Part XVI) তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি তথা ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণমূলক বিশেষ ব্যবস্থাদির কথা বলা হয়েছে।

(১) ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়েছে। লোকসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিনিধি নেই বলে মনে করলে রাষ্ট্রপতি ঐ সম্প্রদায়ের অনধিক দু'জন সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন (৩৩১ ধারা)। অনুরূপভাবে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকা দরকার, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নেই, তাহলে তিনি ঐ সম্প্রদায় থেকে একজনকে বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন (৩৩৩ ধারা)।

আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ∬ মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল আইনসভায় ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা দশ বছর বলবৎ থাকবে। তারপর সংবিধানের ৮ম সংশোধন (১৯৫৯), ২৩তম সংশোধন (১৯৬৯), ৪৫তম (১৯৮০), ৬২তম (১৯৯০) এবং ৭৯তম (১৯৯৯) সংবিধান সংশোধন-এর মাধ্যমে আসন সংরক্ষণের এই মেয়াদ এক-একবার দশ বছর করে ৬০ বছর বাড়ানো হয়েছিল। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেয়াদ ২০১০ সালে ৯৫তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ২০২০ সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

(২) চাকরি সংরক্ষণ ∬ চাকরির ক্ষেত্রেও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংবিধানে ছিল। সংবিধানের ৩৩৬ ধারায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এই ধারায় বলা হয় যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের অব্যবহিত আগে ভারতের ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের রেল, (Customs) বহিঃশুল্ক এবং ডাক ও তার বিভাগে যে ভিত্তিতে নিয়োগ করা হত স্বাধীন ভারতের সংবিধান চালু হওয়ার পর দু-বছর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নিয়ম বলবৎ থাকবে। তারপর প্রতি দু'বছর অন্তর সংরক্ষিত পদ শতকরা দশভাগ করে হ্রাস পাবে। এবং এইভাবে সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছর পর চাকরির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা আর থাকবে না। অর্থাৎ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থার মেয়াদ ১৯৬০ সালে শেষ হয়ে গেছে।

(৩) শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান ∬ ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের অনুকূলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সংবিধানের ৩৩৭ ধারায় উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে ১৯৪৭-'৪৮ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছিল সংবিধান চালু হওয়ার পর তিন বছর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ করবে। তারপর প্রতি তিন বছর অন্তর সংশ্লিষ্ট বরাদ্দের পরিমাণ দশ শতাংশ

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

হ্রাস পেতে থাকবে। অর্থাৎ সংবিধান চালু হওয়ার পর দশ বছরের জন্য এই আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। ইঙ্গ-ভারতীয়দের স্বার্থে শিক্ষা বিস্তারের এই বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থার মেয়াদ ১৯৬০ সালে শেষ হয়ে গেছে।

(৪) **বিশেষ অফিসার নিয়োগ** ।। সংবিধানের ৩৩৮ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাগুলি বাস্তবে কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে তা অনুসন্ধান করার জন্য একজন বিশেষ অফিসার (Special Officer) নিয়োগ করতে পারেন। এই অফিসার রাষ্ট্রপতির কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করবেন। রাষ্ট্রপতি সেই প্রতিবেদন পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষে পেশ করবেন। তবে তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতিদের জন্য নিযুক্ত বিশেষ অফিসারকে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধান-প্রদত্ত বিশেষ ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার এবং সে-বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner